International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 257-268
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.219

রাজনারায়ণ বসুর দৃষ্টিতে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা: বৌদ্ধিক সংকট ও জাতীয় পুনর্জাগরণ

প্রতীক দুয়ারী

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Nineteenth Century India, the colonial education system, despite creating a new intellectual space, mainly aimed to form a middle class supporting colonial rule. Thomas Babington Macaulay's 1835 Minute solidified English education's dominance, marginalizing Indian traditions. Rajnarayan Basu critically analyzed this cultural crisis, proposing an alternative education grounded in national consciousness. This paper explores Basu's educational philosophy, showing he sought to integrate Western knowledge with Indian traditional knowledge and heritage, viewing education as vital for national self-identity, not just employment. He advocated for self-esteem and national awareness against the cultural alienation caused by British policies. Ultimately, Basu's ideas were crucial in critiquing colonial dominance and shaping Indian nationalism, offering a path for national resurgence through the 19th-century cultural crisis.

Keywords- India, British Education System, Cultural Crisis, Rajnarayan Basu, Educational Thought, National Consciousness.

ভূমিকা:

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা শিক্ষাগ্রহণ করত মূলত পাঠশালা ও টোল গুলিতে এবং মুসলিমরা শিক্ষালাভ করত মক্তব ও মাদ্রাসাগুলোতে। টোল গুলিতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো আর মক্তবগুলিতে আরবি বা ফারসিভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। মূলত উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চশ্রেনির মানুষরাই শিক্ষা লাভ করত, আর মেয়েদের শিক্ষার অধিকার ছিলই না বলা চলে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো মৃতপ্রায় ছিল । প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলত ভাষা, ধর্মতত্ত্ব, ন্যায়,ব্যাকরন, পুরান, দর্শন, নীতিবিদ্যাবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ ছিল ধর্মভিত্তিক এবং উদ্দেশ্য ছিল পন্ডিত ও মৌলবী তৈরি করা । ফলত প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুগপোযোগী আধুনিক শিক্ষাপ্রদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। উনিশ শতকের শুরুতে যখন ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চরম ক্ষয়িষ্ণুতার শিকার হয়ে দ্রুত পতনের দিকে চলে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতে নিজেদের সুবিধার্থে ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষাকে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চালায়। মূল উদ্দেশ্য ছিল একশ্রেণীর কেরানী তৈরি করা, তাদের কম বেতনে তারা কাজে লাগাতে পারবে। তারা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে বিচারশক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভারতবর্ষের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শ গড়ে তোলেন। তাই ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য শিক্ষাখাতে ১ লক্ষ্য টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন। যদিও শিক্ষার মাধ্যমের চূড়ান্ত ঘোষণা হয় ১৮৩৫ সালের মেকলে

মিনিটে। এই মিনিটে ইংরাজী মাধ্যমে ভারতীয়দের শিক্ষাদানের কথা বলা হয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "মেকলের লক্ষ্য ছিল অবোধ ভারতবাসীকে বাদামী সাহেবের পরিনত করা। সেই বাদামী সাহেব বুদ্ধিবিবেচনায় এবং রুচিবোধের হবে ইউরোপীয় কিন্তু আবার পুরোপুরি ইউরোপীয় নয় ।"[১] অর্থাৎ তারা একদল নিজেদের সমর্থক ভারতীয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মেকলে এদেশীয় বিদ্যাচর্চাকে কটাক্ষ করে বলেন " A single shelf of a good European library is worth the whole literature of India and Arabia."[২]

ভারতে প্রচলিত এই ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার বহুবিধ এুটি ছিল। ভারতে এই মডেলটি ইংল্যান্ডে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আদলে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করা হয় । এপ্রসঙ্গে এস নুরুল্লাহ এবং জে পি নায়েক মন্তব্য করেছেন

> "They neglected the indigenous traditions as well as the patterns of those progressive countries of the world which were closer to India in their socio economic structure. In fact one cannot help feeling that Indian education was like cindrella tied to the apron strings of the educational system of England and that precisely was the tragedy of Indian educational system."[৩]

যেখানে ভারতের প্রয়োজন ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়মূলক শিক্ষাব্যবস্থা । রাজা রামমোহন রায় তিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের চরম সমর্থক ছিলেন, তিনিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থা একাজে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা এটা কখনো চাননি, তারা এদেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কখনো সুনজরে দেখেনি । আসলে তাদের ভারতে প্রবর্তিত সকল ব্যবস্থার মূলে ছিল আধিপত্যবাদ, শ্রেষ্ঠত্বের দাবী। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভারতীয় চিন্তাবিদসহ জর্জ বাডউড, অ্যানি বেসান্ত, সিস্টার নিবেদিতা প্রমুখ ভারতীয়রাও এই শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলোর সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে,

> "The aim of education is the harmonious sublimation of the faculties and development of the qualities of humanity."[৪]

সতীশচন্দ্র মুখার্জী পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বিদেশী শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন, যে শিক্ষা ভারতীয়দের মধ্যে স্বনির্ভরতা, আত্মসম্মান, দেশাত্মবোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ। তাঁর মতে, এই শিক্ষা প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতেও ব্যর্থ। আবার এই ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পোন্নতির সুযোগ ছিল না, আবার প্রযুক্তিগত কোনো শিক্ষারও অভাব ছিল, শিক্ষাব্যবস্থা কোনোরকম উৎপাদনশীলতার সঙ্গেও সম্পর্কিত ছিল না । ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতামহ হিসেবে অভিহিত রাজনারায়ণ বসুও এই নব্য প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটি গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন (১৮২৬-১৮৯৯)।

রাজনারায়ণ বসুও প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের একজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অচিরেই পাশ্চাত্যের ঝলকানির মোহভঙ্গ হয়ে দেশবাসীর আত্মস্বাধীনতার পথে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। দেশবাসীর আত্মস্বাধীনতার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে তিনি প্রাথমিকভাবে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষাকে।

রাজনারায়ণ বসুর দৃষ্টিতে ব্রিটিশ শিক্ষা প্রণালীর দোষত্রুটি ও শিক্ষাচিন্তা:

উনিশ শতকীয় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ রাজনারায়ণ বসু ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার দিকগুলো অনুধাবন করে তার সঠিক সমাধানের কথাও চিন্তা করেছিলেন।শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি প্রাথমিকভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছিলেন যে, সমকালীন আমলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মাতৃভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি ছিল না। মাতৃভাষার শিক্ষায় বাঙালিদের অধঃপতনের বিষয়ে তিনি 'সেকাল

আর একাল' গ্রন্থে লিখেছেন "সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাংলা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল। আমাদিগের সময়ের কলেজের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে একদিন কলেজে যাইবার সময় রাস্তায় একজন সামান্য লোক একটি বাংলা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম তাহাকে বুঝাইতে অনুরোধ করে। তিনি সে লেখাটি বুঝিতে না পারিয়া তাহার এতদূর লজ্জা উপস্থিত হল যে, ললাটে শ্বেদ বিন্দু নিঃসৃত হতে লাগিল।"[৫] আবার তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, ইংরাজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও ইহার দ্বারা বাঙালিদের যথার্থ বিদ্যা অর্জন হইতেছে না । এর কারন হিসেবে তিনি তৎকালীন শিক্ষাপ্রনালীর কিছু দোষত্রুটি তুলে ধরেছেন।

প্রথমত, তিনি ছাত্রদের গেড়িয়ে দেওয়ার অর্থাৎ সবকিছু মুখস্ত করানোর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর মতে, এর ফলে ছাত্রদের মানসিক বৃত্তিগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার জন্য এইপ্রকার ব্যবস্থায় অধিকাংশ ছাত্রদের পড়াশোনা করানোর ফলে ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের জ্ঞান সঠিকভাবে সঞ্চারিত হয় না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই প্রকার শিক্ষা পদ্ধতির চরম বিরোধী ছিল এবং তা কতটা অপমানকর ছিল তা তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট–

> "আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায় আমাদের খোটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালায় এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনী শক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্তবিদ্যা সঙগ্রহ করিলে মাত্র।"[৬]

রাজনারায়ণ বসু নিজেও একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের পুস্তকের কোনো স্থানের অর্থ একেবারে বলে দিতেন না, প্রশ্ন কৌশলে সেই স্থানের প্রকৃত অর্থটি ছাত্রদের কাছ থেকে বের করতেন। শুধু তাই নয়, উপস্থিত পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধীয় আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গ তুলে ধরে ছাত্রদের বহুজ্ঞতা যাহাতে জন্মে তার চেষ্টা করতেন। ছাত্রদের মধ্যে প্রশ্নশীলতা এবং মুক্তবুদ্ধির সঞ্চারনকে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য বলে জেনেছিলেন এবং সেই দায়িত্ব পালনে তাঁর সমস্ত সময় ও শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। ছাত্ররা রাতে নিজে ভাবতে শেখে, নির্দিষ্ট প্রশ্নের নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় বমি করে ভালো নাম্বার পাওয়াকেই সাফল্য ভেবে ভুল না করে, সব সিদ্ধান্তকে নিজস্ব যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচায় করে নেয়– তরুণ মনে এই ভাবনার প্রতিষ্ঠা ছিল রাজনারায়ণের শিক্ষা চিন্তার মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, তিনি সমকালীন নীতি শিক্ষার অভাবের কথাও তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, স্কুলগুলোতে নীতি শিক্ষা না দেওয়ার ফলে ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্য, মানবসমাজের প্রতি কর্তব্য, জীবনের উদ্দেশ্য কিরূপে সম্পাদন করা যায়, কি প্রকারে পবিত্রমনা ও মহৎ হয়ে জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা যায় তা উপলব্ধি করা নীতি শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। আসলে ছাত্রদের মধ্যে তিনি বৌদ্ধিক ও নৈতিক সততার সঞ্চারন ঘটাতে চেয়েছিলেন, যা ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। সাথে সাথে তিনি ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বীজ বপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে দয়া ও পরোপকারীতা প্রবৃত্তির বিকাশের জন্য রাজনারায়ণ বসু প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্মিলিত সহায়তায় দরিদ্র ভান্ডার খোলেন। যেখান থেকে দরিদ্র ও জরাগ্রস্ত লোকেদের সাহায্য করা হতো । তিনি জানতেন যে, পরাধীন জাতির পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার মন্ত্র কেবল লোককল্যানকর শিক্ষার মধ্য দিয়েই সঞ্চার করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে নতুন সৃষ্টি বা আবিষ্কারের অভাবের বিষয়টি তিনি তুলে ধরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এর কারন হিসেবে তুলে ধরেছেন স্কুল বা কলেজ পরিত্যাগ করার পর অধিকাংশ লোক পড়াশোনা চর্চা ছেড়ে দেয়। এর মূল কারণ হল শুধুমাত্র সরকারি চাকুরি লাভের আকাঙ্খায় পড়াশোনা করা। আসলে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সৃষ্টিহীন কর্মচারীতে রূপায়ন করার চেষ্টাও সফল হয়েছিলেন তার তিনি

সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। আবার যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লেখাপড়ার চর্চা করেন তারাও হীন অনুকরণে রত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু এবিষয়ে দুঃখ করে লিখেছেন, "প্রাচীন কবি কঙ্কন, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রাম বসু ইহাদের কবিতা যেন ঠিক স্বভাবের হস্ত হতে বাহির হইয়াছে। এখনকার অধিকাংশ কাব্যে সেরূপ সহৃদয়তা দেখা যায় না। এখনকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ কহে। যদিও কোনো কারণে পূর্বেকার কাব্য অপেক্ষা কোনো কোনো বিষয়ে অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত হয় কিন্তু জাতীয়ভাব, সারল্য, ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে।"[৭] আসলে তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে হীন অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি স্বসংস্কৃতির উন্নতিতে জোর দিয়েছিলেন। সেই সময়কালে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির মহান কর্তব্য সম্পর্কে বাঙালিকে সজাগের ভাবনা রাজনারায়ণের দূরদৃষ্টিসম্পন্নতার পরিচায়ক।

চতুর্থত, এই তো গেল লেখার বিষয়, তিনি কথোপকথনের ক্ষেত্রেও হীন অনুকরননের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর মতে, এরূপ কথা শুনে ইংরেজরা না হেসে থাকতে পারেন না। যেমন- ধরতাম গোয়িং মথুরায় ইত্যাদি। তিনি মনে করতেন যে, যেখানে বাংলা শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করা যায়, সেখানে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা অন্যায়। তিনি মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধসম মনে করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় southey এর একটি উক্তি উল্লেখের মধ্য দিয়ে

> "আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ ভাষা, সুন্দর ভাষা। ইংরাজী ও জার্মান ভাষার পরস্পর জ্ঞাতিত্ব অনুরোধে জার্মান ভাষোৎপন্ন শব্দ ব্যবহার আমি মাপ করিতে পারি, কিন্তু যেখানে একটি খাঁটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে সেখানে যে ব্যক্তি লাটিন অথবা ফ্রেঞ্চ শব্দ ব্যবহার করে, মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরন করার জন্য তাহাকে ফাঁসি দিয়া তাহার শরীর খন্ড বিখন্ড করা উচিত।"[৮]

আসলে তিনি সাউদির উক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার প্রতি অসীম ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন।

পঞ্চমত, শুধুমাত্র গ্রন্থলেখা ও কথোপকথনেই নয় সকল বিষয়েই তিনি এই হীন অনুকরণ লক্ষ্য করেছিলেন। একটি সামান্য পত্রও ইংরাজীতে লেখা হয়। এবিষয়ে রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেছেন "যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী লিখিতে শিখিতেছেন, তাঁহারা ওই ভাষায় লেখা অভ্যাস করিবার জন্য ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে পারেন, কিন্তু বয়স্ক লোকে এরূপ করেন কেন? বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা হয় কেন? ইহার মানে কী? যে সভার সভ্যেরা বাঙালি, সে সভার কার্যবিবরণী ইংরাজীতে রাখা হয় কেন? ডিবেটিঙ ক্লাব, জুভেনাইল ক্লাব প্রভৃতি সভা, তাহার উদ্দেশ্য ইংরাজী চর্চা এবং ইংরাজী শিক্ষিত বালকেরা যাহার সভ্য, সে সকল সভার সভ্যেরা ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য সভার কার্যবিবরণী ইংরাজীতে রাখিতে পারেন, কিন্তু প্রবীন লোকের সভা তাহার অন্য উদ্দেশ্যে সঙস্থাপিত হয়েছে, তাহার সভ্যেরা তাহার কার্যবিবরণী ইংরাজীতে রাখিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন তাহা বুঝিতে পারি না। "[৯] আসলে তিনি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। ছোট ছোট বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হতে হতে মহৎ বিষয়ে একদিন বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হবে বলে তিনি মনে করতেন।

ষষ্ঠত, শিল্প বানিজ্য অপেক্ষা চাকরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহে বাঙালিদের ঝোঁক ও ব্রিটিশের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধিতেও রাজনারায়ণ বসু আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। এবিষয়ে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্যটি হল "বস্তুত জগৎশুদ্ধ লোক কি কখনো কেরানী অথবা স্কুল মাস্টার অথবা উকীল হতে পারে? শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া কেহ পথ চলে না। অনেকে ব্যারিস্টার অথবা সিভিলিয়ান হবার জন্য বিলেতে যাইতেছেন, কিন্তু কয়জন সেখানে শিল্প অথবা যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে যান? শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগিতার জন্য দিন দিন আমরা দীন হয়ে

পড়িতেছি। ইংল্যান্ডের উপর আমাদের নির্ভরতা দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হবে, ইংল্যান্ড হতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না, ছুরি কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না । এমনকি বিলাত হতে লবন না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না, দেশলাইটি পর্যন্ত বিলাত হতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিয়ে পারি নাই। দেশ হতে কিছু হইতেছে না। বাইরে শেক্সপীয়র, মিল্টন ও ডিফরেনশিয়ল কেলকুলসের চাকচিক্য, ভিতরে সব ভুয়া। আমাদের সকল বিষয়েই সাহেবদের ওপর নির্ভর, তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না ।"[১০] অর্থাৎ রাজনারায়ণ বসু উনিশ শতকীয় শিক্ষিত বাঙালি সমাজের পরনির্ভরশীলতার তীব্র সমালোচনা করে বাঙালির আত্মপরিচয় গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি বাঙালিদের প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার শিক্ষায় মনযোগীতা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, শুধুমাত্র চাকুরির জন্য পড়াশোনায় দেশের মঙ্গলসাধিত হতে পারে না। দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য প্রয়োজন কারিগরি ও প্রযুক্তিতে উন্নতি এবং সেইসঙ্গে বানিজ্যিক উদ্যোগ। সপ্তমত, তৎকালীন সময়ে তিনি ব্যায়াম শিক্ষার অভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি স্কুলগুলোতে ছেলেদের ব্যায়াম শিক্ষা ও অঙ্গচালনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, শুধুমাত্র স্কুল নয় পূর্বে প্রত্যেক গ্রামেও কুস্তির আখড়া ছিল।

'All work and no play makes jack a bad boy' এই মতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। খেলাধুলা না করলে বালকের অপকার হয়। এমনকি স্কুলের গাদা গাদা বই মুখস্থ করতে গিয়ে বালকেরা রুগ্ন হয়ে পড়ে। ফলত শিশুদের ভোজন শক্তি ও শারীরিক বল বীর্য হ্রাস পায়। সেকারনে তিনি ইংরাজী শিক্ষা প্রনালীকে মানুষ মারার কল বলে অভিহিত করেছেন। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ও এই বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন "It May be expected that education will give to the individual a strong and healthy body."[১১] আবার তিনি ছাত্রদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে বসার জন্য ক্লাসরুমে পিঠের জন্য ঠেস ও পায়ের জন্য টুল এর ব্যবস্থা করেছিলেন। অষ্টমত, তিনি ছাত্রদের শারীরিক দন্ড প্রদানের বিরোধী ছিলেন। গল্পের ছলে শিক্ষাদানের কথা বলেন, যাতে ছাত্রদের মনযোগ সহজেই আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া শ্রেনিকক্ষে শিক্ষক কেবল বক্তা ও ছাত্র নির্লিপ্ত শ্রোতা- এই শিক্ষাদান পদ্ধতি তার মন:পুত ছিল না। তিনি বলেছিলেন যে, যে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে না আছে বালক কর্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা, না আছে শিক্ষক কর্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা। আমি শিক্ষার এই প্রনালীকে ঘৃনা করি। তিনি ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি চালনা ও বক্তৃতা শক্তির বৃদ্ধির জন্য বিতর্কসভা স্থাপন করেছিলেন।

নবমত, স্ত্রী শিক্ষার বিষয়েও রাজনারায়ণ বসু সম্যক সচেতন ছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ন-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নতি হতে পারে না একথা তিনি জানতেন। সেকারনে তিনি নারী শিক্ষা বিস্তারেও অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন। নারীশিক্ষার জন্য তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার বর্তমান নাম অলিগঞ্জ রিনি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়। ভারতীয় স্ত্রী লোকেরা দশ বা বারো বৎসর অবধি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে, তাহাতে কেবল বর্ন ও শব্দপরিচয় হয় মাত্র, অত:পর আর কোনো লেখাপড়া চর্চাই থাকে না বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে রাধাকান্ত দেবের সৎ উদ্যোগের জন্য তিনি তার উচ্চকিত প্রশঙসা করেছেন এবং এবিষয়ে সকল শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। হটী বিদ্যালঙ্কারের উদাহরণ টেনে তিনি নারী সমাজকে পড়াশোনায় অনুপ্রানিত করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, হটী বিদ্যালঙ্কার অষ্টাদশ শতকের একজন বিদ্যাবতী বাঙালি কন্যা ছিলেন, তার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম । ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে কাশীতে টোল প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করতেন। এছাড়া বারানসীতে সকল মহিলাদের শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি

নারী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগের জন্য তৎকালীন বিটন সাহেবের ও প্রশংসা করেছেন। বিটন সাহেব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'কন্যাপেবঙ পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নত" শ্লোক দ্বারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বালিকাদের স্কুলে পাঠাবার জন্য আবেদন করতেন। তবুও সেকালে নারী শিক্ষায় মানুষের অনীহার জন্য রাজনারায়ণ দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এমনকি তিনি স্ত্রীর শিল্প শিক্ষার উপরেও জোর দিয়েছিলেন। নারীরা 'producer of producers' এই মতের বিপক্ষে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। নারীদের গৃহকোন থেকে বের করে তাদের স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি তাদের সূত্র উৎপাদন ও কার্পেট উৎপাদনে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বয়স্ক মানুষদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় গড়ে তোলার উপরেও জোর দিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু তৎকালীন প্রেক্ষাপটে নিজ শিক্ষাদর্শনকে কর্মক্ষেত্রে সুচারুভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং বহুমাত্রায় সফল হয়েছিলেন, যা মেদিনীপুরবাসী কর্তৃক রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে স্পষ্ট–

> " অত্রন্ত বালিকা বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারম্ভাবধি আপনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং সমধিক যত্ন ও উৎসাহসহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়, ডিবেটিঙ ক্লাব, মিচুয়েল ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটি, জ্ঞানদায়িনী, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলো সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হয়ে পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্বক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন। .....আপনি এদেশের যাদৃশ উপকার ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন, আমরা তাহার কি প্রতিশোধ দিব? তাদৃশ রিনের কিছুতেই পরিশোধ নাই।"[১২]

রাজনারায়ণ বসু দেশীয় মানসালোকে শিক্ষার বীজবপনে কতখানি আত্মনিয়োজিত ছিলেন তা তাঁর মেদিনীপুরবাসীকে লিখিত একটি পত্রে স্পষ্ট–

> "স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হবে, অজ্ঞান ও অধর্ম হতে নিষ্কৃতি পাবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সঙস্কৃতিবান হয়ে মনুষ্যসমূহের মধ্যে গন্যজাতি হবে।"[১৩]

একথাটি তিনি তাঁর সমাধিতে উৎকীর্ণ করার জন্য মেদিনীপুরবাসীকে আবেদন করেছিলেন। এককথায় স্বজাত্যবোধদ্বারা রাজনারায়ণের শিক্ষাভাবনা অনুপ্রানিত ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই দেশবাসীর হৃদয় আলোকিত হতে পারে, আত্মনির্ভরশীলতার আদর্শ জাগ্রত হতে পারে এবং একাজকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, সঠিক যুক্তিবাদী ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া দেশবাসীর পক্ষে সঠিক যুক্তিনিষ্ঠ ধর্মাচরণ সম্ভব নয়, সমাজ সংস্কার সম্ভব নয় ও জাতীয় ভাব নির্মানও সম্ভব নয়।

রাজনারায়ণ বসুর চেতনায় ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল:

উনিশ শতকীয় ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মন্দ ফলাফল সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। এবিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন

> "তখনকার শিক্ষার ফলে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদলের এমনি সংস্কার হয়েছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করতেন এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের ওপর জয়লাভ করা।"[১৪]

এমনকি তারা হিন্দু ব্রাহ্মণদের বাড়ির সামনে গিয়ে আমরা গোরু খাই গো, গোরু খাই বলাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের ওপর আঘাত মনে করতেন। আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষার ঝলকানি নব্য শিক্ষিতদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দেশীয় সবকিছুকেই মন্দ ও পাশ্চাত্যের সবকিছুই ভালো এই ভাবনা তাদের যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তিকে আঁচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের পারে সাথে কিতাবি শিক্ষার ভার শিশুদের ওপর বাড়ায় তারা আর খেলাধুলা, ব্যায়ামচর্চায় সময় পায় না । ফলত দিন দিন তারা বলবীর্যহীন হয়ে পড়ছে । শারীরিক বিকাশ ঠিকমত হচ্ছে না। একটি ছেলে সমস্ত দিন গড় গড় করে পড়া মুখস্থ করলে তাকে শান্ত ছেলে বলা হয়- তিনি এর বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে, এটিই সর্বনাশের গোঁড়া। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশীয় মানুষরা সবকিছুতেই ইংরেজদের অনুকরণ করতে যান। পাশ্চাত্যের সমস্তকিছুকেই আধুনিক মনে করেন। যেমন গোমাংস ইংরেজদের প্রধান আহার। বাঙালিদের প্রধান আহার ভাত, ভাল, রুটি, দুধ, মাছ। এজাতীয় খাবার এদেশীয় জলবায়ুর পক্ষে উপযোগী। কিন্তু ইংরেজরা গোমাংসভোজী বলে বাঙালিরাও তাদের সঙ্গে এবিষয়ে যোগ দেন । এবিষয়ে তিনি একটি গল্পের কথা উল্লেখ করেছেন

> "একবার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙালিবাবু আহার করিতে গিয়েছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না। তিনি খানসামাকে জিজ্ঞেস করিলেন, বিল হ্যায় ? খানসামা উত্তর করিল, নহি হ্যায় খোদাওন্দ , বাবু পুনরায় জিজ্ঞেস করিলেন, বীফস্টিক হ্যায় ? খানসামা উত্তর করিল, ও ভি ন্যাহি হ্যায় খোদাওন্দ? বাবু পুনরায় জিজ্ঞেস করিলেন, ওকসটঙ হ্যায় ? খানসামা উত্তর করিল ও ভি ন্যাহি হ্যায় খোদাওন্দ। বাবু পুনরায় জিজ্ঞেস করিলেন কাফসফুট জেলি হ্যায়? খানসামা উত্তর করিল ও ভি ন্যাহি হ্যায় খোদাওন্দ। বাবু বলিলেন, গোরুকা কুচ হ্যা ন্যাহি? এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু যিনি ওরটা গোমাংস প্রিয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত হয়ে বলিলেন, ওরে! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবর এনে দেনা। এবিষয়ে যাহারা ইংরাজী জানেন না, তাহারাও ইংরেজ ওয়ালাদিগের অনুগামী হয়েন।"[১৫]

ইংরাজী শিক্ষিতরা শারীরিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করে অনেক মঙ্গলকর দেশীয় পুরাতন প্রথা ত্যাগ করে যুক্তিহীনভাবে বিভিন্ন ইংরাজী রীতি অবলম্বন করে থাকে। অনেক ইংরাজী রীতি ভারতের পক্ষে মানানসই নয়। তবুও তারা তা উপযুক্ত কিনা সেটা বিবেচনা না করেই অনেক ইংরাজী রীতি অবলম্বন করে। ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা বুকে পড়ার কারণে মানুষের চাহিদা বাড়লেও ইউরোপীয় উপায় শিল্প বাণিজ্য এদেশে বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হয় না। ফলত দুর্নীতিপরায়ণতা বেড়েছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙালিদের মাতৃভাষায় চর্চা কমেছে। আবার সঙস্কৃত ভাষার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার ফলে দেশীয় ঐতিহ্যের পতন ঘটছে। এমনকী ছাত্রদের কোনো বিষয়ে ভালো করে না বুঝিয়ে শুধুমাত্র পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার জন্য গিলে নিয়ে বমি করানোর ব্যবস্থার তিনি কঠোর বিরোধিতা করেছেন। কেননা এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী সঠিক শিক্ষা লাভ করতে পারে না ও তার বিশ্লেষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হয় না। নীতি শিক্ষার অভাবের কারণে মহৎ জীবনযাপনের অর্থ মানুষ ভুলতে বসেছে। স্ত্রী শিক্ষার অভাবের ফলে সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। সর্বপোরি কথোপকথন, পত্র লিখন, বাঙালি সভ্যদের সভাতে মাতৃভাষার বদলে ইংরাজীর ব্যবহার রাজনারায়ণ বসুর হৃদয়কে আঘাতপ্রাপ্ত করেছিল। তাঁর মতে, এর ফলে বাঙালির আত্মাভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত, হচ্ছে না বাঙালি যুবসমাজের মধ্যে। এমনকি ইংরেজদের অভিপ্রায়ের ফাঁদে পা দিয়ে নব্য শিক্ষিতরা শুধুমাত্র সরকারি চাকুরির দিকে ঝুঁকছে। এর পরিনতিতে দেশে বানিজ্য, প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতি সম্ভবপর হচ্ছে না। বাঙালি জাতি সরকারি মেশিনে পরিনত হচ্ছে। দেশের প্রগতি মন্থর হয়ে পড়ছে। এখন বাঙালিরা বিলাত বিদ্যাশিক্ষা করতে যান। বিলাতে গেলে অনেক উপকার আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা বিলাত হতে ফিরে

আসেন তাঁহারা দেশীয় সমাজের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। বিলাত থেকে এমন সাহেব সেজে আসে না কারো সাথে পোশাকে মিলে, না ব্যবহারে। যে জ্ঞানের আলো তারা লাভ করে আসেন তার দিয়ে স্বদেশবাসীকে আলোকিত না করে একেবারে সমাজ ছাড়া হয়ে বসেন। তাঁরা বাঙালি ও ইংরেজ উভয় দলের কাছে ত্যাজ্য হয়ে যান। দেশীয় মানুষদের সঙ্গে তারা মিলে না, আবার ইংরেজরাও তাদের অনুকরনকারী শাখামৃগ মনে করে । এখানে রাজনারায়ণ বসু নব্য শিক্ষিত বাঙালিদের মানসিকতা ও সেইসঙ্গে তাঁদের প্রতি দেশীয় মানুষ ও ইংরেজদের মনোভাব খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এই ইংরাজী অনুকরণের দরুন সমাজ সংস্কারের গতি বিপথগামী হয়েছিল দেশের সমাজ সংস্কারকরা যদি স্বদেশীয়ভাবকে পত্তনভূমি করে সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন তাহলে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তার অনেক বেশি গ্রহনযোগ্য হবে বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর , ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। এনারা সকলে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই যুক্তি তুলে ধরে সমাজ সংস্কারে অগ্রনী হওয়ায় কিয়ৎপরিমানে কৃতকার্য হয়েছিলেন। বিজাতীয় ভাষা, বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় ধর্ম যে এ দেশীয় সমাজের গ্রহনযোগ্য ও স্থায়ী হবে না এবিষয়ে তিনি চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের 'অধিকারতত্ত্ব' গ্রন্থটির একটি মন্তব্য তুলে ধরেছেন

> "ইংরাজদিগের রীতিনীতি, ভাবভঙ্গি অনুকরণ করার ইচ্ছা আমাদিগের যুবকদিগের মনে বলবতী হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনর্থক কতিপয় ভাবভঙ্গি রীতিনীতি অনুকরণ করা কেবল হীনতামাত্র । তাহাকে উদ্ধার বলে না, তাহা হীন অনুকরণ শব্দের বাচ্য।"

চারিত্রিক অধ:পতন এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবক নিজের অশিক্ষিত পিতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হত । ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এইরূপে মানুষ অসরল হয়ে ওঠে, খলতা মানুষকে গ্রাস করে ফলত তিনি তৎকালীন সভ্যতার অপর নাম স্বার্থপরতা দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত চিত্র অবলোকন করলে প্রতীত হয় যে, পাশ্চাত্য প্রভাব প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের ক্রম অবনতি ঘটিয়েছিল। বাঙালি নিজেদের পুরোনো গুণগুলি হারিয়েছিল অথচ ইংরেজদের সকল সদগুনগুলি অনুসরণের প্রয়োজনবোধ করেননি। অনেক মহরত ভদ্র ইংরেজ আমাদের অনুকরণের কেন্দ্র হতে পারতেন। তাদের সাহস অধ্যাবসায়, দৃঢ়তা, শ্রমশীলতা আমাদের অনুকরনীয় উপাদান হতে পারত। কিন্তু যত মন্দগুন, অধম প্রবৃত্তি, দেশীয় ঐতিহ্যের সমস্তকিছুর প্রতি অনাস্থা এনে পরিচয়হীন, অনুকরনপ্রিয় বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্যটি প্রনীধানযোগ্য

> "চার্লস বৃক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া নৈসর্গিক নিয়মানুসারে পরিমিত সূর্যকিরন সেবনে মধুর গুণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা বহিরাগত করিয়া অনৈসর্গিকরূপে অপরিমিত সূর্যকিরন সেবন করাইলে তা তাড়িতে পরিনত হয়। সেইরূপ যদি হিন্দুসমাজ আপনাতে আপনি থাকিয়া অর্থাৎ আপনার মর্যাদা না হারাইয়া স্বীয় আচার ব্যবহার সকলকে পাশ্চাত্য আলোক স্বাভাবিকক্রমে সেবন করায়, তাহা হইলে তাহা উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া উহা আপনাতে আপনি না থাকিয়া ঐ সকল আচার ব্যবহারকে ঐ আলোক অস্বাভাবিক আতিশয্যের সহিত সেবন করাইতেছে; ইহাতে কেবল এই ফল হইতেছে, যে উক্ত গাজিয়া উঠিয়া ভ্রষ্টাচাররূপ জঘন্য তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে।"[১৬]

প্রাথমিক পাশ্চাত্য শিক্ষা তৎকালীন যুবসমাজের যে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের দৃষ্টিকে একপেশে করে দিয়েছিল, তার পরিনতিতে তারা দেশীয় ঐতিহ্যের সমস্তকিছুকে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে আক্রমন শুরু করেছিল তার ফল যে ভালো হয়নি এবং স্থায়ী হয়নি উপরন্তু বৃহত্তর জনসমাজ তাদের বর্জন করেছিল- একথা রাজনারায়ণ

বসু উপরোক্ত মন্তব্যটির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন। আবার এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন যে, যখন আমরা শারীরিক বল বীর্য হারিয়েছি, যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস হচ্ছে, যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরাজী অনুকরণে পরিপূর্ণ- যখন দেশের শিক্ষাপ্রনালী এত অবনত যে তার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হয়ে কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়- যখন বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা প্রদান হয় না- স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত , তখন সমাজ সংস্কারে আমরা যথেষ্ট কৃতকার্য হতে পারছি না , যখন চারদিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা প্রবল– সেই অবস্থায় আমাদের উন্নতি সম্ভব নয়। আসলে উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজ আধুনিক হওয়ার লোভে প্রলুব্ধ হয়ে অত্যন্ত অনুকরনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সকল বিষয়েই সাহেবরা অনুকরনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে, সে অনুকরণ আমাদের দেশের উপযোগী কিনা , তার দ্বারা আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব কিনা? সাহেবরা পর্যন্ত যে সাহেবী প্রথা এদেশের উপযোগী নয় মনে করেন, তাহাও আমরা অবলম্বন করতে সঙ্কুচিত হয় না। এইভাবে বাঙালিরা অনুকরণপ্রিয়তার মাধ্যমে অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাসে পরিনত হয়ে যাচ্ছিল, মানসিকভাবে উপনিবেশায়িত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যেও রাজনারায়ণ বসুর উপরোক্ত মন্তব্যটিই ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন "ইংরেজ যাহা পরে, যাহা খায়, যাহা করে, সব ভালো, এই ভক্তি আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে।... ইঙরেজ এরূপ নিরুদ্যম অনুকরণ কারী নহে। ইংরেজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড় হইয়াছে।.... সুতরাং ইংরেজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরেজত্ব আমাদের পক্ষে দুর্লভ হবে।"[১৭] (ভারতবর্ষীয় সমাজ প্রবন্ধ,প্রবন্ধ সমগ্র, প৮৫)। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় রাজনারায়ণ বসুও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন না, আসলে তিনি যুক্তিহীন নির্বিচার অনুকরণের বিরুদ্ধে ছিলেন, বাঙালির আত্মশক্তির জাগরনের পক্ষে ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন "দেশ-কাল-পরিবেশ-সমাজ নির্বিশেষে কোনো একরকমের আধুনিকতা হতে পারে না। পরিবেশ অনুযায়ী, সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেশে আধুনিকতার রূপ ভিন্ন।"[১৮] (পা চট্টোপাধ্যায় ১৭৫)। রাজনারায়ণ বসু সঙ্গতভাবেই মনে করতেন যে, যুক্তিসম্মত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরের যে সমস্ত ধ্যানধারনা, আচার ব্যবহার গ্রহন করা সঠিক মনে হবে তাই গ্রহন করা উচিত। বস্তুতপক্ষে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভারতীয় সমাজকে যথার্থভাবেই আধুনিক ও স্বনির্ভর, প্রগতিশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই আধুনিকতাকে বিচার করতে হবে বর্তমান যুগের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে, আবেগের বশবর্তী হয়ে নয় বা বিজাতীয় ধ্যানধারনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও নয়।

রাজনারায়ণ বসু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবের শুধুমাত্র সমালোচনা করেননি, এর ভালো দিকগুলিও তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এর প্রভাবে শিক্ষিতদলের মধ্যে ঘুষ নেওয়া নিন্দনীয় বলে পরিগণিত হয়েছে, স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কার্যকলাপ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। তাঁরা হিন্দু ধর্ম ও রীতিতে অনেক দোষ অনুধাবন করতে সমর্থ হয়ে এর প্রতি নির্বিচার আক্রমন শুরু করে। এর পেছনে ছিল ডিরোজিও সাহেবের পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী শিক্ষা। আসলে ডিরোজিও এক ব্যাপক সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই স্বভাবের কারণেই ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে ডিসেম্বর The government gazette এ ডিরোজিওকে ক্ষনিক উত্তেজনা-র বশবর্তী ব্যক্তি বলা হয়েছে। কিন্তু ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্যের নির্বিচার অনুকরণপ্রিয়তা ও দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা থাকলেও তাদের দেশভক্তি ছিল নিখুঁত ও প্রগাঢ় । ডিরোজিওর মৃত্যুর নবতর পর রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ডিরোজিওর দেশভক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে রাজনারায়ণ বসু তার একটি কবিতার কয়েকটি পঙক্তি তুলে ধরেছেন

"My country! In the days of glory past
A beauteous halo circled round the brow,
And worshipped as a deity thou wast." [১৯] (সেএ ২৫)।

রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের ছাত্র হলেও ডিরোজিওর ছাত্রদলের চিন্তাভাবনার সঙ্গে তার তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। ডিরোজিওর ছাত্রদল পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করলেও রাজনারায়ণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমন্বয়সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন ও দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি নির্বিচার আক্রমন করে প্রকৃতপক্ষে যুক্তিহীনতা ও অন্ধ সমর্থনের শিকারে পরিণত হয়েছে তা রাজনারায়ণ বসু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেইকারনে হিন্দু কলেজের ছাত্র হলেও তিনি ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব মুক্ত ছিলেন।

এতদসত্ত্বেও রাজনারায়ণ বসু স্বদেশবাসীর প্রতি তার অকুণ্ঠ বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন–

"হে স্বদেশ হিতৈষী! তুমি এমন মনে করিও না যে, সমুদায় ভারতবর্ষ এরূপ ইংরাজী ভাবে অনুবাদিত হয়েছে। স্বজাতীয়ভাবে মানবের স্বাভাবিক অধিকার। সে অধিকার হতে স্বভাবতঃ কেহই ভ্রষ্ট হইবেক না। যদি ইংরাজেরা স্বজাতীয় ধর্মাধিকার হতে ভ্রষ্ট না হন, তবে আমরাই কি এত হীন হয়েছি যে, ভারতমৃত্তিকার উৎপন্ন ধর্মভাব হতে পরিভ্রষ্ট হব। যদি ইংরাজেরা স্থূলধর্ম প্রতিপাদক বাইবেল ত্যাগ না করেন, তবে আমরাই কি এত মূঢ় হয়েছি যে, ভারতমৃত্তিকার মঙ্গলপ্রসূনস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্র ত্যাগ করিব ? এইসকল ধম্মভাব, এসকল ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার গুরুভারের সহিত শতকোটি বাইবেল, ইঞ্জিল, জবুর, কোরান, অবেস্তা, পারকর, নিউম্যান, কান্ট, কুজিন প্রভৃতির স্তূপায়মান গ্রন্থসমূহ সমতুল্য হয় না।"[২০] (সেএ ৬৩-৬৪)। শুধু তাই নয়, তিনি স্বাভিমান বর্জিত, আত্মগৌরব সম্পর্কে বিস্মৃত নব শিক্ষিত বাঙালি জাতির আত্মজাগরনের জন্য তাঁদের সামনে জাতির অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরেছিলেন-

> "সমুদ্র সেন, চন্দ্র সেন প্রভৃতি রাজারা তারা পান্ডবদিগের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁহারা বাঙালি ছিলেন। রাজকুমার বিজয় সিংহ যিনি সিংহল জয় করেছিলেন এবং যাহার সিংহ উপাধি হতে ওই উপদ্বীপ সিংহল নামে আখ্যাত হয়েছে তিনি একজন বাঙালি ছিলেন। চাঁদ, বনস্পতি, শ্রীমন্ত সওদাগরেরা, যাহারা সমুদ্রবানিজ্যে পটু ছিলেন তাহারাও বাঙালি ছিলেন। দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল প্রভৃতি সার্বভৌম সম্রাট যাহারা কর্নাট হতে তিব্বত পর্যন্ত দেশ সকলকে করপ্রদ করিয়াছিলেন তাঁহারাও বাঙালি ছিলেন।"[২১] (সেএ ৮১)।

তিনি আশাপ্রকাশ করেন যে, এই বাঙালি জাতি আবার আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠবে।

রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় রাজনারায়ণ বসুর ভাবনায় উদারনীতিবাদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। আপন ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল হলেও রাজনারায়ণ বসু রক্ষনশীল ছিলেন না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের মেলবন্ধনের ভাবনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে রাজনারায়ণ বসু অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মেদিনীপুরবাসী তার শিক্ষাভাবনা ও উদ্যোগের দ্বারা শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু নিজ শিক্ষাভাবনাকে কর্মক্ষেত্রে সুন্দরভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন তা মেদিনীপুরবাসী কর্তৃক লিখিত একটি পত্রে স্পষ্ট– "আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, উন্নতি এবং তন্নিমিত্ত যতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গননা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি আপনার পদের কার্য যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে নির্বাহ করিয়াছেন তাহাতেই এই প্রদানের মহোপকার সাধিত হয়েছে।...বস্তুত আপনি বিদ্যালয়টিকে সম্যক উন্নত করিয়া এদেশে জ্ঞান ও সুনীতির বহুল বিস্তার সাধন করিয়াছেন।"[২২] (আত্মচরিত, ১২৪)।

স্বনির্ভরতার ধারণা ও রাজনারায়ণ বসু:

উদার ভাবনা থেকেই রাজনারায়ণ বসু উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকদের বিবিধ কার্যকলাপের বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তার মতে, স্বনির্ভরতা হল উদারনীতির প্রাথমিক শর্ত। রাজনারায়ণের শিক্ষা চিন্তা বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। তিনি মনে করতেন যে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য চিন্তার স্বাধীনতা অপরিহার্য। রাজনারায়ণ বসু রামমোহন পরবর্তী সময়কে ও সেসময়ে ব্রিটিশ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল এবং সেইসঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চেতনাকে পরিলক্ষিত করেছিলেন, দেশবাসীর পরনির্ভরশীলতাকে সচক্ষে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই কারনে তিনি জাতীর গৌরবেচ্ছা সঞ্চালনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একাজে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে তিনি শিক্ষাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি কারিগরি ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষায় জোর দিয়েছিলেন। বাঙালি যুবসমাজকে পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এভাবে ই জাতির সামাজিক ও নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটবে, ছাত্ররা মহান জাতীয় কর্তব্যের আদর্শে দীক্ষিত হবে । এককথায় বলা যায় রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরসূরী হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন। রামমোহনের স্বদেশবাসীর মঙ্গলসাধনের আদর্শকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি জনগণকে আত্মনির্ভরশীলতা ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে রাজনারায়ণ বসু ছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি চির অনুরক্ত। স্বদেশের ধর্ম, সাহিত্য, সঙস্কৃতির প্রতি তার নিষ্ঠা ছিল অটুট। পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহ তাকে কোনদিনও গ্রাস করতে পারেনি।

উপসংহার:

উনিশ শতকের শেষার্ধের ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম চিন্তাবিদ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সময়কাল ছিল পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট। নতুন চিন্তাধারার প্রভাবিত সংস্কারবাদীগন ভারতের অচল সামাজিক আচরনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত অধিকাংশ সংস্কারবাদী ছিলেন ভারতীয় সমাজের বৃন্তচ্যুত। ইংরাজী আদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি ও দৈনন্দিন চালচলন অনুসরণ করলে ইংরেজ শাসনে প্রতিপত্তি লাভ করা যাবে এই আশায় এবং নিজেকে আধুনিক প্রতিপন্ন করার বাসনায় অনেক শিক্ষিত যুবক সাহেবিয়ানায় অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ভারতের চিরাচরিত প্রবহমান ঐতিহ্যে আস্থাশীল স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমেই চেষ্টা করেছিলেন এই পরানুবাদ, পরানুকরন, পরমুখাপেক্ষী দাসসুলভ দূর্বলতা দূরীভূত করতে। তিনি বলেছিলেন "অনুকরন দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোনো বস্তুই আপনার হয় না; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হলেই কি গদর্ভ সিংহ হয়?"[২৩] (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা -উদ্বোধন)। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হেনে চিন্তাশীলতার পথ প্রশস্ত করেছে একথা মেনে নিয়েও বিবেকানন্দ শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে, তোতাপাখির ন্যায় কিছু তথ্য দ্বারা মস্তিষ্ক পূর্ন করলেই প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয় না; প্রবল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন, চরিত্রগঠন, জাতি সংগঠন এবং বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়সাধন করার শক্তি আয়ত্ত করতে পারলেই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা যায়। আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মশক্তি জাগরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যে শক্তি অর্জিত হবে স্বদেশীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, স্বদেশীর শিল্প স্থাপন ও সমস্ত ক্ষেত্রে স্বদেশীয় ভাবধারায় অনুপ্রানিত হয়। এই শক্তি হবে আত্মার শক্তি বা সত্যের শক্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাজনারায়ণ বসুর আত্মনির্ভরশীলতার ও স্বাভিমানের আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু আপামর বাঙালি সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তার প্রভাব

বিশ শতকের জাত্যাভিমানী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই বাঙালির মধ্যে আত্মনির্ভরতার ভাবনা দেখা যায়। চাকরিবৃত্তি ছাড়াও বাঙালিরা চিকিৎসাবিদ্যা, শিল্পোদ্যোগ, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রেও ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. Bandopadhyay, Sekhar. Plassey Theke Partition o Tarpor. Orient Blacksawan. Hyderabad. 2006. P.90.
২. Mukhopadhyay, Goutam. Banglar Jatiotabad: Rammohan Theke Aurobindo. Purnapratima Prakashani. Kolkata. P.152.
৩. Nurulahha, S and Nayek, J, P. History of Education in India. Macmillan. Delhi.1951. P.861.
৪. Chattopadhyay, Bankimchandra. Bankim Rachanabali. Subham Publishers. Kolkata. 1986. P.584.
৫. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal, Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.45.
৬. Tagore, Rabindranath. Prabandha Sangraha. Satyam Publishers. Kolkata. 2018. P.127.
৭. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.51-53.
৮. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.53.
৯. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.54.
১০. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.55-56.
১১. Pabitra, Education and The aim of Human Life. Sri Aurobindo Ashram Publication. Pondicherry. 2006. P.4.
১২. Basu, Rajnarayan. Atmacharit, Kuntaline Press. Kolkata. 1909. P.126-127.
১৩. Basu, Rajnarayan. Atmacharit, Kuntaline Press. Kolkata. 1909. P.131.
১৪. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.27.
১৫. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.37-38.
১৬. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.76-77.
১৭. Tagore, Rabindranath. Prabandha Sangraha. Satyam Publishers. Kolkata. 2018. P.85.
১৮. Chattopadhyay, Prtha. Itihaser Uttaradhikar. Ananda Publishers. Kolkata. P.175.
১৯. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.25.
২০. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.63-64.
২১. Basu, Rajnarayan. Sekal o Ekal. Balmiki Yantra. Kolkata. 1874. P.81.
২২. Basu, Rajnarayan. Atmacharit. Kuntaline Press. Kolkata. 1909. P.124.
২৩. Vivekananda, Swami. Vivekananda Rachana Samagra. Kamini Press. Kolkata. 1998. P.57.